*International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-IV, Issue-I, July 2017, Page No. 1-8*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*

# শিক্ষার মাধ্যম 'বাংলা' : সমীক্ষা ও সম্ভাবনা

**ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়**
*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstract***

*Bengali is our mother language. Many renowned persons like Vivekananda, Tagore, Subhaschandra Bose, Jibanananda Das and other have told in favour of our mother language. But nowadays, it is visibly noticed that the devotion towards mother language among bengalee is unnaturally decreasing. Even many child of our bengalee family are being nurtured as well as encouraged to learn in English rather than Bengali. Many well to do bengalee family, even in rural area are seeking English Medium Schools as they are feeling contentment to see the better future prospect of their children are building up there. So far, in competition to English Medium Schools, the Bengali Medium Schools are recoiling day by day. This is a horrible and dangerous trend that's going on in our society. The renowned persons have told the necessity of education by mother language in their valuable essays and letters, but possibly, those are not being followed or practiced by our advanced generation. In my article, I have tried to point out the historical importance of our mother language. I have also tried to raise some problems related to this field and make out some remedies to overcome the problems.*

***Key Words: Mother Language, English Medium School, Historical Importance, Necessity of Education, Problems, Remedies.***

আদি থেকে অধুনাতন শিক্ষাবিদ, ধর্মসংস্কারক, লেখক, শিল্পী, সমাজসেবী প্রমুখ সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কসূত্র নির্ণয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। এ প্রসঙ্গেই মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষাদান তথা জ্ঞানার্জনের বিষয়ে তাঁদের কথিত উদ্ধৃতিগুলি তাঁদের প্রবন্ধে বারে বারেই উঠে এসেছে। বলাইবাহুল্য, আদর্শনিষ্ঠ এইসকল উদ্ধৃতি ও ভবিষ্যবাণীগুলিকে ব্যক্তিজীবন, সমাজ জীবন. সমাজ তথা রাষ্ট্রের আচরণীয় অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করার চেষ্টা আজও সমানভাবে অব্যাহত। তা সত্ত্বেও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ঘটে চলা নানাবিধ অবমূল্যায়ণ, স্বার্থকেন্দ্রিক ব্যক্তি জীবনে রুজি-রুচির পরিবর্তন তথা বিশ্বায়নের ধাক্কা সবকিছুর মতোই আঘাত হেনেছে শিক্ষাব্যবস্থা সহ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মতো মহোত্তর আদর্শবোধেও। সমস্যা দেখা দিয়েছে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পদ্ধতি থেকে পরিকাঠামোয়। এসবের নিরিখেই কখনো আশা আবার কখনো বা আশঙ্কার দোলায় দোলায়িত হয়েছে আমাদের আজন্মলালিত মাতৃভাষা বাংলা।

ইংরেজ আমলে 'নববাবু'রা ইংরেজিয়ানার দাপটে মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করতে শিখেছিল। বাংলা না-জানাটা তাদের কাছে পরিণত হয়েছিল গর্বের বিষয়ে। উপনিবেশিত মনের এই বিভ্রম উপলব্ধি করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, লিখেছিলেন— 'যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে'। একসময় স্বামী বিবেকানন্দও মাইকেল মধুসূদনের বিরাটাকার প্রতিভা ও কীর্তি প্রসঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন- 'ঐ একটা অদ্ভুত genius(প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল। 'মেঘনাদবধে'র মতো দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইওরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।' 'মেঘনাদবধ' এর বীররসাত্মক শৈলী স্বামীজিকে খুব আকৃষ্ট করত। এবারে আসা যেতে পারে মাতৃভাষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানধারণা প্রসঙ্গে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২০ ফেব্রুআরী আমেরিকা থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে স্বামীজী যে পত্র লিখেন তাতে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ফুটে ওঠে। আলমোড়া থেকে ১১ জুলাই, ১৮৯৭ সালে শুদ্ধানন্দকে লেখা চিঠিতেও স্বামিজী বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের বই কেনার ব্যাপারে তাঁর দেওয়া নির্দেশের বিষয়ে জানতে চান (পত্রাবলী দ্রষ্টব্য)। তবে বিবেকানন্দ বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে চলিত ভাষার উপর জোর দিয়েছিলেন। তাই তাঁর 'বাঙালা ভাষা' প্রবন্ধে বলেছিলেনঃ "আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়?" ভাষাকে তিনি করতে চেয়েছিলেন সাফ ইস্পাতের মতো। নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দের চলিত-প্রীতি বাংলাভাষায় শিক্ষাদানে এক বড় মোড় এনে দিয়েছে, যার সুফল এখনও বিদ্যমান। মাতৃভাষায় চলিতের সহজবোধ্যতা ও ব্যাকরণগত সংক্ষিপ্ত নির্মাণই এর বড় কারণ ও মূল আকর্ষণ। তা যেমন বঙ্কিমচন্দ্রীয় সাধুরীতিকে আজ প্রাচীন যাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে তেমনই মাতৃভাষায় দর্শন-বিজ্ঞান চর্চার কলেবর ও পরিসর দুই-ই বৃদ্ধি করেছে। তবে একথাও সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা উপন্যাস যেমন আজও ব্রাত্য নয় তেমনই সাধুরীতি সমৃদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলা' কিংবা 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর চেয়ে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' কিংবা দীনবন্ধুর 'নীলদর্পন' এর চলিতরীতির গদ্য বাংলাভাষাকে আরো বেশী গতিশীলতা দান করেছে।

রবীন্দ্রনাথের অনুচিন্তনে প্রোথিত বিষয়াবলির মধ্যেও অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ ছিল বাংলাভাষা৷ তাঁর বহু প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে মাতৃভাষা বাংলার সপক্ষে মতামত পাওয়া যায়৷ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষা বাংলার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন৷ মাত্র বাইশ বছর বয়সে 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন, ''ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ তাহা বাংলায় প্রকাশ কর, বাংলা সাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষে বাংলা বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক৷'' মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে বাংলাদেশে সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন ও উৎসাহিত ছিলেন৷ বঙ্গাব্দ তেরো শ'র আষাঢ় সংখ্যায় তিনি শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা এখনো উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন- ''কোন শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে চাইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়৷'' শুধু ভাব প্রকাশের বাহন নয় বাংলাভাষাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন চর্চার বাহন হিসেবে পেতে তিনি বলেছেন, ''বাংলাভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে; কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা চাই৷'' তিনি চেয়েছিলেন বাংলাভাষা যেন সবল ও সতেজ হয়৷ বঙ্গাব্দ তেরো শ' এগারোতে তিনি 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ''বৈয়াকরণের যে সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই, শিশুকাল হইতে স্বভাবত আমি ব্যাকরণভীরু; কিন্তু বাংলাভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এই জন্য তাহার সহিত তন্নতন্ন করিয়া পরিচয় সাধনে আমি

ক্লান্তিবোধ করি না।'' রবীন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধার প্রতিরূপ হলো তাঁর দুই অসামান্য গ্রন্থ 'বাংলাভাষা-পরিচয়' ও 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'। ১৯৩২ সালে অধ্যাপক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা ছিলো রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের হিতার্থে বেশ কিছু ভাষণ দেবেন এবং বাংলাভাষার অধ্যয়ন ও গবেষণাকর্মের উন্নতি সাধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা করবেন। গবেষণা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, ''বর্তমান বাংলা বানানে যে বিশৃঙ্খলা চলছে তার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা আবশ্যক এবং এ কাজের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই গ্রহণ করা উচিত।'' একই সঙ্গে তিনি বাংলায় বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা প্রণয়ন ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উত্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুসারে গঠিত হয় বহুল পরিচিত 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতি।' ঐ সংস্কার সমিতির প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬-এর মে মাসে 'বাংলা বানানের নিয়ম' শিরোনামে। বাংলাভাষার যে নিজস্ব ব্যাকরণ নেই সে কথাও প্রথম মনে করিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথই। বাংলা ব্যাকরণ যে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত হতে পারে না সেই কথা সামনে রেখে তিনি তাঁর 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনার দিক নির্দেশনা করেছেন। ইংরেজ আমলে বাংলা ভাষার উপনিবেশায়নের শুরু। অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষার এই উপনিবেশায়ন চলেছে। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলা গদ্যের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ সেই ঔপনিবেশিক কালেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন মাতৃভাষাকে। ১৮৮৫ থেকে শুরু করে ১৯৪১ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বিভিন্ন রচনায় তিনি বাংলা ভাষার উপনিবেশায়নের বিরোধিতা করেছেন। যদিও বাংলাভাষা শিক্ষায় প্রকৃতই উপনিবেশায়ন হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের আজও ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে।

মাতৃভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা এবং শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষা বাংলা প্রচলনের প্রবল দায়িত্ববোধ প্রসঙ্গেই এসে পড়ে তাঁর পরিভাষা-ভাবনার কথা। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ বাংলা পরিভাষা নিয়ে কাজ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, ''গল্প কবিতা নাটক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়।'' বাংলাভাষায় শক্তির আয়োজন করতে গিয়ে প্রয়োজন পড়ে পরিভাষার। বাংলা পরিভাষা তৈরির কাজও শুরু হয় উনিশ শতকে এ দেশে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত কালে। বাংলা পারিভাষিক শব্দ তৈরির বিভিন্ন নীতিকৌশল নিয়ে সেসময় পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিলো। কেউ চেয়েছিলেন শব্দের সহজবোধ্যতা, কেউ শব্দের শ্রুতিমাধুর্য অথবা শব্দের দার্ঢ্য। কেউ ছিলেন শুধুই সংস্কৃতনির্ভর, কারো বা পক্ষপাত ছিল আরবি-ফারসি অথবা দেশী শব্দের ওপর। রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন পারিভাষিক শব্দের প্রকাশ-সামর্থ্য ও যাথার্থ্যের ওপর। শব্দের অর্থের মধ্যে তিনি সবসময় যুক্তি খুঁজতেন। যুক্তিতে না টিঁকলে তিনি সরাসরি মূলভাষার শব্দটিকে গ্রহণ করতেন, যেমন করেছিলেন 'রোমান্টিক' শব্দের বেলায়। এই শব্দের তিনি সরাসরি কোনো বাংলা পরিভাষা করতে যাননি। পয়ারের শোষণক্ষমতা প্রমাণে যেমন ব্যবহার করেছেন "দুর্দান্ত পান্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত"-এর মতো শব্দনিচয় তেমনই 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থানুসারে 'রোদসী' শব্দের ব্যবহারেও তাঁর নবনির্মিত শব্দসৃজনের প্রয়োগ-দক্ষতার সন্ধান মেলে। রবীন্দ্রনাথের এই নবনির্মাণ বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারে নবগঠিত শব্দের সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করেছে। তবে এতকিছুর পরেও উপযুক্ত পরিভাষা নির্মাণের অলসতা আজও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে।

কথায় বলেঃ 'মহাজনে যেন গত: স পন্থা'। মহাভারতের এটি একটি জনপ্রিয় শ্লোকও বটে। যদিও শ্লোকটি প্রাচীন ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে উদ্ধৃত তবুও জীবনের সকল ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও আজও যে শ্লোকটির বহুল ব্যবহার মেলে তা নানা গুণিজনেরও শিক্ষা-বিষয়ক মতামতেই চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আরও একজনের নামও চলে আসে। তিনি হলেন বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু আগামী প্রজন্মের উদ্দেশ্যে যে চিরস্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন তা হলোঃ "যারা বলেন যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়, তারা

হয় বাংলা জানেন না, নয়তো বিজ্ঞান জানেন না।"। বাঙালি জাতি তাঁকে নিয়ে গর্বিত। বিশ্ব বিজ্ঞানসভায় বাঙালি জাতি যে একান্তই বহিরাগত, অযোগ্য ও অপাঙ্ক্তেয় নয়, বরং মর্যাদার আসন লাভ করতেও সক্ষম, তা প্রমাণ করেছেন যে কজন বিজ্ঞানী, সত্যেন বসু তাঁদের মধ্যে প্রধান একজন। তাঁর নাম যুক্ত হয়ে পড়েছে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর আবিষ্কৃত কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের জন্য। তবে আলবার্ট আইনস্টাইন আমাদের কাছে যতটা পরিচিত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ততটা নন। কারণ প্রচার মাধ্যমে আইনস্টাইন সুযোগ পেয়েছেন সত্যেন বসুর চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া স্বদেশী বিজ্ঞান সাধকের প্রতি আমাদের উৎসাহ বরাবরই কম। এ আমাদেরই দীনতা। সত্যেন বসু মনে প্রানে প্রচন্ড ভাবেই ছিলেন বাঙালী। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার ক্ষেত্রে তার অমূল্য অবদান রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে কলকাতায় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' গঠিত হয়। এই পরিষদের মুখপাত্র হিসাবে বাংলা ভাষার বিজ্ঞান পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশিত হয়। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-এ কেবলমাত্র মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ নিয়ে রাজশেখর বসু সংখ্যা প্রকাশ করে তিনি দেখান, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের মৌল নিবন্ধ রচনা সম্ভব। উল্লেখ্য জাপানে বিজ্ঞান গবেষণামূলক নিবন্ধগুলি আজও ইংরেজী নয় বরং তাদের মাতৃভাষা জাপানীতেই লেখা হয়। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের পিতা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ভগবান চন্দ্র বসু ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও ভগবান চন্দ্র কখনও তাঁর নিজের ছেলেকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করাননি। জগদীশ চন্দ্রের প্রথম স্কুল ছিল ময়মনসিংহ জিলা স্কুল। জগদীশ কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে পড়াশোনা করে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। এই কলেজে ইউজিন ল্যাফন্ট নামক একজন খ্রিষ্টান যাজক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ওপর তাঁর আগ্রহ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরপর তিনি আই.সি.এস. পরীক্ষায় বসার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও ভগবান চন্দ্র এতে রাজী হননি কারণ তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র একজন বিদ্বান হোন। বাংলা স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব যুক্তি ছিল ইংরেজি শেখার আগে এদেশীয় ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষা আয়ত্ত্ব করা উচিত। বাংলা স্কুলে পড়ার ব্যাপারটি জগদীশ চন্দ্রের জীবনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমনি তা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতেও সাহায্য করেছে। এর প্রমাণ বাংলা ভাষায় রচিত জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধগুলি। ভাষার প্রতি বিশেষ মমত্ববোধ ছাড়াও ভগবান চন্দ্র চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র দেশের আপামর জনসাধারণের সাথে মিলেমিশে মানুষ হোক এবং তার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হোক।

একসময় জীবনানন্দ দাশও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যত নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৬ চৈত্র ১৩৫৮ বা ১৯৫১ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহে তা প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায়। সেখানে জীবনানন্দ প্রথম বাক্যেই বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আশঙ্কার কারণ হিসেবে বলেছেন, "পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হবার পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কি হবে-কি হতে পারে— ভেবে দেখেছি মাঝে মাঝে।" জীবনানন্দের আরো আশঙ্কা, "পূর্ব বাংলার যে সব হিন্দু-মুসলমান আছে, তারা এতদিন বাঙালি বলে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা নিজেদের খুব সম্ভব বাঙালি বলতে পারেন না। তাঁরা পাকিস্তানি। পশ্চিম বাঙলার দেশিয় অধিবাসীরা অবশ্য বাঙালি।" বস্তুতঃই পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম বাঙলা উভয় অঞ্চলেই বাংলা ভাষা যে প্রায় একই বন্দোবস্তের শিকার হয়েছিল পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রে, একথা আমরা সকলেই জানি। অন্নদাশংকর রায়ও তাঁর প্রবন্ধে স্বাধীন ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে আবারও দেশ ভাগ হওয়ার আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুতঃই রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলার নানা শক্তিশালী উপভাষা থাকা সত্ত্বেও জোরের সাথে উর্দুকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা ছিল। বাঙালির ওপর পাকিস্তানি জাতিয়তাবাদের পরিচয় চাপিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টাও সেসময় সর্বদাই চলেছিল। সচেতন 'তমুদ্দিনী' সাহিত্য তৈরির চেষ্টা ছিল, পাকিস্তানি পরিচয়ে গর্ব বোধ করাতে তা শেখাবার চেষ্টাও ছিল যার একটা আপাত প্রভাব বাংলা মাতৃভাষী শিক্ষাব্যবস্হার উপরও পড়েছিল। এখনও এর কিছু প্রভাব বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্হাতে বর্তমান। ভারতেও স্বাধীনতার পর বাংলা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে বিশেষতঃ উত্তর ভারতের শিক্ষাব্যবস্হায় রাষ্ট্রভাষা হিন্দিতে

শিক্ষাদানের পদ্ধতি চালু থাকায় বালাভাষী শিক্ষার্থীরা সেখানেও মাতৃভাষা শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছে। অনেকে বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মাতৃভাষা প্রায় ভুলেই গেছেন। সুতরাং এ আশংকা আজও সত্য বই কি!

জীবনানন্দের আরো আশঙ্কা ছিল এই যে, বাঙালির সংখ্যা আজ ক্রমশঃ কমে চলেছে। জীবনানন্দের ভাষায়ঃ "বিভাগের আগে দেশে যত বাঙালি ছিল, এখন নতুন বাঙলায় (পশ্চিম বাংলায়) পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক উদ্বাস্তু এসে পড়া সত্ত্বেও তার চেয়ে ঢের কম বাঙালি আছে। পশ্চিম বাংলা এত ছোট যে চোখে দেখে ও নজির নেড়ে চেড়ে মনে হয়, লোকের চাপে তা উপচে পড়ছে, আর ঠাসাঠাসি চলে না। কিন্তু আসল কথা, বাংলাদেশে বাঙালি ঢের কমে গিয়েছে। মন্বন্তরে গিয়েছিল, কিন্তু এবারে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের আমরা হারিয়েছি।" বাংলায় যখন উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া চলছিল এবং সুনীতিকুমারের মতো বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীরাও যখন পশ্চিমবঙ্গে 'নিখিল-ভারতীয় সর্বজন-বোধ্য রাষ্ট্রভাষা' নামে হিন্দির পক্ষে ওকালতি করছেন, হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বলছেন তখন জীবনানন্দেরএ কথা চমকানোর পক্ষে যথেষ্ট বৈ কী! (ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা, প্রথম প্রকাশ পৌষ, ১৩৫১, রূপা এন্ড কোম্পানি মুদ্রিত ১৯৯২ সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। জীবনানন্দ জোর দিয়েছিলেন বাংলা উপভাষার উপর। তাঁর মতেঃ "পূর্ব বাংলার লোকদের আগে বাঙালি বলা হত; তাদের নাম বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা এখন স্বভাবতঃই পাকিস্তানি। শুধু নাম বা অন্য দু'চারটে ছোট বড় জিনিসেরও পরিবর্তনে অনেকদিনকার রক্ত-মাংস আত্মার পরিবর্তন হওয়া কঠিন। বাংলা, পূর্ব বাংলার লোকদের অনেক শত বৎসরের সাহিত্য ও সমাজ-সংসারের ভাষা। পূর্ব বাংলার মুসলিমরা কয়েকশো বছর ধরে ওদিককার নানা উপভাষায় লিখে ও বলে যে বিশেষ সার্থকতা দেখিয়েছেন ভাষার সেই সুস্থ অপর্যাপ্ত প্রকাশ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার এখনকার আপাতসুস্থতা কতদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে ভাবনার বিষয়। বড় উপভাষা যদি ক্ষয় পায় তাহলে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ কেমন হয়ে দাঁড়াবে!" জীবনানন্দের আরো সংযোজনঃ "পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু যদি রাষ্ট্রভাষা ও জনভাষা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এমন সময় আসবে যে পূর্ব বাংলার উপভাষাগুলো কারো মুখে কোথাও শুনতে পাওয়া যাবে না। এত ভালো, এত বড় বড় উপভাষা এরকমভাবে যদি ফুরিয়ে যায় তাও যেতে পারে; কারণ মানুষের বুদ্ধিবিচার প্রায়ই মূল্য সংরক্ষণ করতে চাইলেও ইতিহাস সাদা চোখে দেখে সব।.....আমার মনে হয় বাংলার শ্রেষ্ঠ উপভাষাগুলোর বেশিরভাগ পূর্ববাংলায় এবং সেখানে কয়েক শো বছর ধরে সিদ্ধি লাভ করেছে। পূর্ব বাংলার প্রবাদে-বচনে-ছড়ায়-গীতিকায় ও মুখের ভাষার বিশদ ও ক্রান্তিগভীর তাৎপর্যে তার প্রমাণ রয়েছে। উপভাষাগুলো মাতৃভাষার থেকে উৎপন্ন হয়ে মাতৃভাষাকে নিয়ন্ত্রিত ও নতুন নতুন সূচনা নিয়ে উৎপন্ন হতে সাহায্য করেছে।" বলাবাহুল্য, উপভাষার প্রয়োগও মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে একসময় যথেষ্ট সম্পন্ন ও স্বয়ম্ভর করেছে যা আজ আর ভাষাচর্চার বিষয়েই শুধু নয় বরং মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উপভাষার প্রয়োগ-স্বাধীনতাকেও ভয়ংকরভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্থ করে তুলেছে। বলাবাহুল্য, এই উপভাষারীতিই চলতি ভাষায় সাহিত্য রচনাকে একসময় জনপ্রিয়তা প্রদান করেছিল। ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও মুখের ভাষা (অন্তত শিক্ষিত সমাজে যা সবচেয়ে বেশি প্রসার পেয়েছিল) প্রায় পুরোপুরি পশ্চিমবাংলা ঘেঁষা ভাষাই ছিল। পূর্ববাংলায় তখন ও তার অনেক আগে থেকেই উপভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছিল, মুখের ভাষা বিকাশ পাচ্ছিল; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সুধী সাহিত্যিক বা চলতি সমাজের খেয়ালে তা বড় একটা নজরে আসেনি। বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই এ সব উপভাষায় রচিত সাহিত্যের বিশেষত্ব বাঙালি অনুভব করতে পেরেছে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মৌখিক বুলি ও লৈখিক পদ্ধতিতে চলিতের দাপট আজও অটুট, কিন্তু শহুরে, শিক্ষিত মানুষের শিক্ষাদানে ও শিক্ষাগ্রহণে নিঃসন্দেহে উপভাষা তার পূর্ব গৌরব হারিয়েছে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সমস্যায় প্রথমেই আসা যেতে পারে শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গে। শিশুশিক্ষার জন্য সবচেয়ে সঙ্গত, স্বাভাবিক ও কার্যকরী মাধ্যম হলো স্ব-স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাদান। এই সত্যটি শিশুর ভাষাশিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা আজ দেশে-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। আদিবাসী শিশুদেরও নিজ-নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করাটা জরুরি। কিন্তু এ প্রসঙ্গটি বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। এ রাজ্যে সত্তর থেকে আশি

ভাগ এমন শিশু গ্রামে বাস করে যাদের ভাষা-মাধ্যম বাংলা। বাকি কুড়ি থেকে ত্রিশ ভাগ বাঙালি শিশু বাংলার শহর ও শহরতলিগুলিতে বাস করে। এদের ভাষামাধ্যমও বাংলা কিন্তু এদের অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিচালনার ফলে এইসব শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষা যথার্থ পথে বিকশিত হচ্ছে না। বর্তমান ভোগবাদী সমাজে শহুরে বাঙালি উচ্চবিত্ত এমনকি নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মধ্যেও সম্প্রতি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলামাধ্যমের বদলে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রতি আসক্তি ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি কলকাতার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলিতে ছাত্রভর্তির সংখ্যা সরকারী অথবা আধা-সরকারী স্কুলগুলির তুলনায় হু হু করে বেড়ে চলেছে। এক্ষেত্রেও অভিভাবকদের মধ্যে প্রধানতঃ এই মানসিকতাই কাজ করছে যে ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষিত হলে তাঁদের সন্তানরা বাংলা মাধ্যমে শিক্ষিত সন্তানদের তুলনায় পরীক্ষায় অনেক বেশী ভালো ফল করবে ও ভবিষ্যতে জীবনের উচ্চতর পেশাতেও সাফল্যের সঙ্গে প্রবেশ ও উন্নতি করতে পারবে। শুধু তাই নয়, মেধাবৃদ্ধির পাশাপাশি শিশুদের ভবিষ্যতে আধুনিক, কেতাদুরস্ত ও যুগোপযোগী করে তোলার যে নিশ্চিত গ্যারান্টি ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলি দিচ্ছে অভিভাবকরা সেই আকর্ষণ অথবা প্রলোভনকেও আর অস্বীকার করতে পারছে না। ফলে কষ্ট হলেও মোটা টাকার বিনিময়ে তারা নিজেদের সন্তানদের ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলিতে ভর্তি করাতেই ক্রমশঃ আগ্রহী হয়ে উঠছে। কিন্তু একালের অভিভাবকদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজি ভাষাই শুধু নয়, অন্য একাধিক যেকোনো ভাষাতেই শিশুর দক্ষতা অর্জন অবশ্যই প্রশংসনীয়, তবে কোনো অবস্থাতেই তা তার মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে নয়। শৈশবে ভিন্ন ভাষায় শিক্ষা লাভের ফলে শিশুর পারিপার্শ্বিকতা সহ ভাব ও ভাষার মধ্যে প্রকৃত সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে না। এর করুণ পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধেও লিখেছেন— "আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না।" ফলে ভাব ও ভাষার সুষম বিকাশের লক্ষ্যে অবশ্যই প্রয়োজন শিশুকে তার মাতৃভাষায় যথার্থ অর্থে শিক্ষিত করে তোলা।

শিক্ষার শুরুতেই বাবা-মা বা অভিভাবকদের শিশুর ভাষামাধ্যম সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কেননা, পরিবারের মধ্যে ও পরিবারের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিশুশিক্ষার সূচনা ঘটে। শিশুর ভাষাশিক্ষা আয়ত্তিকরণ বিষয়ে গবেষকদের মত হলো, অনুকরণের মাধ্যমে শিশুরা ভাষাকে ধাপে-ধাপে রপ্ত করে থাকে। এ কারণে পরিবারের ভেতর বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনেরা কীভাবে ও কী ভাষায় কথা বলছেন, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে শিশুরা শুধু ভাষাই নয় সেইসঙ্গে আয়ত্ত করে নানা বাচন ভঙ্গি। এমনকি, গৃহপরিচারক-পরিচারিকার ভাষা থেকেও শিশুরা প্রভাবিত হয়ে থাকে। ফলে, শিশুকে মার্জিত ও প্রমিত বাংলা শেখানোর জন্য গৃহপরিচারক-পরিচারিকাদের ভাষা-ব্যবহারেও সতর্ক থাকা বিশেষ জরুরি। ভুল শেখার কারণে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় 'মাতাপিতা' শব্দটিকে শিশু যদি 'মাথার ফিতা' বলে উচ্চারণ তাহলেও অবাক হওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকে না! পাশাপাশি, পরিবারের সদস্যরা প্রচার মাধ্যমে কোন ভাষায় খবর, নাটক, সিনেমা দেখছেন সেটাও শিশুর ভাষাশিক্ষায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আজকাল শহুরে পরিবারে বিরতিহীন হিন্দি সিরিয়াল ও সিনেমা দেখার প্রবণতা বাড়ছে। ফলে শিশুদের মধ্যে হামেশাই হিন্দি-বাংলা মিলিয়ে এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলার লক্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভাষাশিক্ষার প্রথম ধাপেই তারা ভ্রান্ত পথে চালিত হচ্ছে। অভিভাবকরা একমাত্র নিজেদের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই এই দুর্লক্ষণগুলি থেকে শিশুদের মুক্ত করতে পারেন। একইভাবে, শিশুর শিক্ষা ও খেলার জন্য কোন ভাষার উপকরণ (বই, সিডি, খেলনা ইত্যাদি) কেনা হবে— সে বিষয়েও বাবা-মা-দের সচেতন থাকা উচিত, কারণ সেগুলিও শিশুর ভাষাশিক্ষার সহায়ক। শিশু-শিক্ষায় আজকের দিনে আরেকটি শক্তিশালী প্রভাবক হলো— প্রচারমাধ্যম ও প্রযুক্তি। সমগ্র দেশের শহরগুলোতে খেলার মাঠ ক্রমশ বিরল হয়ে উঠছে। ফলে শহুরে শিশুর বিনোদন গড়ে উঠছে টেলিভিশন, কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ভিডিও গেমস ও ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে।এই প্রভাবের নেতিবাচকতায় বিচলিত না হয়ে কীভাবে তাকে মাতৃভাষাশিক্ষায় ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানো যায় সেদিকেই আমাদের এখন মনোযোগ দেওয়া উচিত। শিশুশিক্ষার উপযোগী সিডি, বই, খেলার মাধ্যমে শেখার বিভিন্ন উপকরণ ছাড়াও ছড়া-গান-গল্প-অভিনয়-

জাদু সব কিছুর মধ্যে দিয়েই শিশুর মাতৃভাষার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। বর্ণমালা, গণিত, বিজ্ঞান, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, জেন্ডার সমতা, সামাজিক আচরণ, সৃজনশীল ভাবনা মূলক পাঠের ক্ষেত্রেও যথাযথভাবে মাতৃভাষাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিশুশিক্ষা নিয়ে কাজ করছে এমন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিক প্রলোভন অথবা মুদ্রণশৈলীর দীনতায় যেন কোমলমতি শিশুরা কখনই ভুল বানান না শেখে সে বিষয়ে প্রকাশনালয়গুলিকে আরো বেশি সজাগ হতে হবে। আবার, শিশুরা যেহেতু অনুকরণপ্রিয়, তাই বাড়িতে বাবা-মাকে নিয়মিত পড়াশুনা করতে দেখলে শিশুও তার পাঠের প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে বলা যায়, একটি শিশুর ভাষা-অর্জনের প্রারম্ভ থেকেই বাবা-মা-সহ পরিবারের সকলেরই শিশুর মাতৃভাষায় শিক্ষা-অর্জনের যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কে সজাগ থাকাটা বিশেষ জরুরি। পরিবারের পরেই আসে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রসঙ্গ। এখন শহরে, বিশেষ করে উভয়েই কর্মরত বাবা-মা-রা সাড়ে তিন বা চার বছর বয়স থেকেই শিশুকে কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে চান। এইসব কিন্ডারগার্টেন ও প্রি-প্রাইমারি স্কুল ও তার শিক্ষকদেরও দায়িত্ব হলো খুদে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া কারণ আদর্শ শিক্ষকরা অবশ্যই জানেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে কোনো শিশু যে কোনো শিক্ষা যত দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তা অন্য কোনো ভাষাতেই তার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয়।

এবারে আসা যেতে পারে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান প্রদানের সমস্যায় আরো কিছু বৃহত্তর তথা ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে। অনেক সমালোচকই বলে থাকেন, ভারতবর্ষে ইংরেজের উপনিবেশায়নের ফল এক ভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সাথে ভাষাগত ক্ষেত্রেও নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছিল। এই উপনিবেশায়নের ফলে ভাষার ক্ষেত্রে যে যে ধরনের পরিবর্তনগুলি এসেছিল তার ফলে প্রথমতঃ স্থানীয় ভাষার ব্যবহারিক জগৎ থেকে প্রমিত বাংলা ভাষা সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত হয়ে গেলো। ইংরেজরা যে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিলেন তা এককথায় সংস্কৃত শব্দগন্ধী আইন-আদালতের ভাষা। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যমান বাংলা ভাষাকাঠামোর ক্ষেত্রেও এক আমূল পরিবর্তন ঘটলো। বাংলা গদ্যের রূপ বদলে গেলো। হঠাৎ করেই বাংলা গদ্যে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে ও জোরপূর্ব্বক প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আমদানি করা হলো। সংস্কৃত শব্দমুক্ত এবং আরবি-ফারসি শব্দযুক্ত প্রচলিত, সর্বসাধারণবোধ্য সরল গদ্যরীতিকে গ্রহণ না করে একটি কৃত্রিম রীতিকে উদ্ভাবন করা হলো। ঔপনিবেশিক প্রভুর ইঙ্গিতে সংস্কৃত পন্ডিতেরা এটি করলেন। এর ফলে বাংলা গদ্য তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও গতি হারিয়ে ফেলে একসময় জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। তৃতীয়তঃ উপনিবেশিতের ভাষা বাংলাকে হটিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল করলো উপনিবেশকের ভাষা ইংরেজী। সমাজে এর মিশ্র প্রভাব বরাবরই ছিল, আজও আছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে একসময় মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের বাহন করতে চেয়েছিলেন। একথা ঠিক যে, আজ রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে মাতৃভাষায় (গারো, খাসিয়া, কামতাপুরী, সাঁওতালি প্রভৃতি নিজ নিজ আঞ্চলিক মাতৃভাষায়) শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব না হলেও বড় সহজ কথা নয়। 'মাতৃভাষা' মানে কী? লেখার ভাষা সাধারণত কারও মাতৃভাষা হয় না। বলার ভাষাই হলো মাতৃভাষা। মাতৃভাষা বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা শিখতে হয় না, তা নিজে থেকেই অর্জিত হয়। প্রমিত শৈলীর বাংলা ভাষা বাংলা হলেও তা তো অন্ত্যজের মাতৃভাষা নয়! কারন, তার মাতৃভাষায় আছে সেই আঞ্চলিক কথ্য বৈশিষ্ট্য যা হয়তো প্রমিত বাংলায় নেই, আদৌ যার ব্যাকরণও হয়তো বা নির্মিত হয়নি।

মোটামুটি ভাবে মাতৃভাষা রূপে বাংলায় শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের উন্নতি ঘটাতে রাষ্ট্র-সমাজ-পারিবারিক স্তরে নিম্নলিখিত কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ অবিলম্বে আবশ্যক। পদক্ষেপগুলি হলোঃ

১. উচ্চশিক্ষা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজে অবিলম্বে বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

২. প্রমিত বাংলা ব্যাকরণের প্রসারণ ঘটিয়ে তন্মধ্যে আদিবাসী শব্দের আভিধানিক অর্থ সংযোজন করা।

৩. বাংলার বিভিন্ন ভাষাভাষি সহ আদিবাসীদের জন্য পৃথক বাংলা অভিধান রচনা করা।
৪. বিভিন্ন ভাষাভাষি সহ আদিবাসীদের প্রচলিত ভাষাগুলিকে গল্প-কবিতা ইত্যাদির আকারে পাঠক্রমে আনা।
৫. বাংলা বানানকে বাংলা ভাষার উচ্চারনানুগ করে তোলা।
৬. ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলিতে শিশুদের ভর্তি বিষয়ে অভিভাবকদের অতি স্পর্শকাতরতা কমানো, প্রয়োজনে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলির পঠন-পাঠনে ব্যাবহৃত তিনটি ভাষার মধ্যে একটিকে বাংলা হিসাবে গ্রহণ আবশ্যক করা।
৭. পারিবারিক স্তরে শিশুশিক্ষায় প্রভাব বিস্তারকারী ভুল শব্দ উচ্চারণে অভিভাবকদের যত্নশীল হওয়া।
৮. বাংলায় আরো বেশী সৃজনশীল সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্হ রচনা করা।
৯. বাংলার জাতিয়তাবোধকে উৎসব ও সম্প্রীতিমূলক অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা।
১০. সরকারী ও আধা-সরকারী বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো।
১১. বিদেশে বসবাসকারী বাঙালীদের বাংলায় আরো বেশী সাহিত্য ও বিজ্ঞান গ্রন্হ রচনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া।
১২. বাংলার কৃতি বাঙালীদের পেশাগত খ্যাতি বা আর্থিক সুবিধার লোভে বিদেশে চলে না যাওয়া ইত্যাদি।

তবে এর মধ্যে সব থেকে বেশি প্রয়োজন আদিবাসীদের জন্য অভিধান প্রনয়ণ। আপাতদৃষ্টিতে এ কথা হয়তো মনে হতে পারে যে, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হলে অথবা শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা হলে সংখ্যাগুরু বাঙলাভাষীদের সুবিধা হতে পারে, কিন্তু অন্তেবাসীকে তো সেই দ্বিতীয় ভাষাতেই শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে যা তার মৌখিক ভাষা, নিজের প্রাণের ভাষা। বর্তমান মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের এ এক তীব্র সমস্যা। এটাও সঠিক যে, অদ্যাবধি লেখা প্রতিটি বাংলা ব্যাকরণই সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের এক অক্ষম অনুকরণ। সুকুমার সেন নিজে লিখেছিলেন, তিনি নিজে এবং সুনীতিবাবু এই 'পাপ' করেছেন টেক্সটবুক বোর্ডকে খুশি করার জন্যে। সুতরাং যাঁরা আজও সুকুমার সেন কিংবা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে স্কুল পাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ লিখে চলেছেন স্বাভাবিকভাবেই তারাও সেই একই পাপ করে চলেছেন, এপার এবং ওপার বাংলায়। এটা কিন্তু ইংরেজের উপনিবেশায়নের ফল নয়। বাংলায় একাধারে শিক্ষিত, দক্ষ ও সৎ ভাষাবিজ্ঞানীর অভাব ছিল এবং এখনও আছে। যতদিন পর্যন্ত এ অভাব পূরণ না হবে, ততদিন পর্যন্ত যথার্থ অর্থেই আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচিত হবে না। সে কারনেই মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের চলন বৃদ্ধি করতে বাংলা আকাদেমি সহ সাহিত্য ও শিল্পবোদ্ধাদের যথেষ্ট ভূমিকার প্রয়োজনকেও আজ আর মোটেই অবহেলা অথবা অস্বীকার করা যায় না।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ**

১. বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ : একটি পর্যালোচনা, মোহাম্মদ আজম, আদর্শ প্রকাশনী।
২. বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, ২য় খন্ড, অনুবাদ ও সম্পাদনা সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, কামিনী প্রকাশনালয়, মাঘ ১৪১৮।
৩. জীবনানন্দের আশা ও আশঙ্কায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, পর্ব-১, ফিরোজ আহমেদ।